দৈনিক বাংলা

অদ্য 5 OCT 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শাসন এবং সোহাগের কাহিনী

আমাদের অনেকেরই স্কুলের শিক্ষাজীবন রোমান্টিকতায় ভরপুর নয়। আমাদের বয়সের মানুষেরা, যাদের স্কুলে পড়ার সুযোগ হয়েছিল তাদের মধ্যে শিক্ষকের বেতের বাড়ি খায়নি এমন লোক খুঁজে পাওয়া ভার। বেতানেতে অনেক শিক্ষকের এমনও নাম ছিল যে তাদের কথা শুনলেই থরথরির কম্প উপস্থিত হত শিক্ষার্থীদের মধ্যে। শুধু কি আর বেতের বাড়ি, মোটা বেত, জোড়া বেতও ছিল। তার ওপর ডাস্টারের গুঁতো, কপালে চাড়া দিয়ে রোদে দাঁড় করানো, আঙুলের ফাঁকে পেন্সিল দিয়ে চাপ দেয়া, চড় থাপ্পড় এসব তো ছিলই। কখনও কখনও কোন কোন ঘটনায় গণপিটুনিরও ব্যবস্থা ছিল। সেইসব অবস্থা এখন কতটা চালু আছে জানি না। এইসব বেতমারার ব্যবস্থার ফলে কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি বা লাভবান হয়েছি বলতে পারি না। কিন্তু অংক ক্লাসে অংক না পারা নিয়ে ভয়ে ভয়ে থেকেছি, আরবী ক্লাসে সঠিক অর্থ না পারার জন্য ভয়ে ভয়ে থেকেছি, ইংরেজী ক্লাসে প্রশ্নোত্তরে ঠেকে যাবো কি না তা নিয়েও ভয়ের অন্ত ছিল না। এইভাবে ভয়ে ভয়ে যে মাধ্যমিক স্কুল পর্যন্ত শিক্ষাজীবন কাটিয়েছি তা স্পষ্ট মনে আছে।

আগের দিনে অভিভাবকরা শিক্ষকের হাতে সন্তান তুলে দিয়ে বলতেন, 'জানটা শুধু আমার, হাড়মাংস আপনাদের। গড়ে পিটে মানুষ করে দেবেন।' গড়াটাই যদিও মুখ্য তবু পিটাটাও ছিল। পিটিয়ে পিটিয়ে গড়া হত। সম্ভবত সেটাই সে সময়ের রেওয়াজ ছিল। এখন আর আমরা ব্যাপারটাকে সেভাবে দেখি না। আমরা যদি বলিই, তাহলে বলি সন্তানকে গড়ে দেবেন। পেটার ব্যাপারটা আমাদের পক্ষেও মেনে নেয়া দুষ্কর।

স্কুল শিক্ষকের হাতে শিক্ষার কারণেই শিক্ষার্থীরা বেতখাওয়ার মত পরিস্থিতির সম্মুখীন হত। হয়ত ব্যক্তিগত রোষ থেকে কোন শিক্ষক কোন ছাত্রকে পেটাননি। তা সত্ত্বেও এখনকার দিনে অভিভাবকের সেই মনোভাব অনেকখানি বদলে গেছে। শিক্ষক ছাত্রকে মেরেছিলেন বলে গোটা এলাকার লোক জড় হয়ে সেই শিক্ষককে পিটিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে এমন ঘটনাও ঘটেছে এই রাজধানী ঢাকা শহরে। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এমন খবর বিরল নয়। সন্তানের প্রতি মানুষের মমত্ব অপরিসীম। সম্ভবত সে কারণেই এ ধরনের দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু পড়াতে বসালে আমরাও যে নিজেদের সন্তানদের চড়-চাপড় দেই না, তা কিন্তু নয়, কিন্তু চড়চাপড়ের দায় দায়িত্ব অন্য কারও হাতে আমরা তুলে দিতে চাই না। ছোট্ট বাচ্চাকে প্রাইভেট টিউটরের হাতে তুলে দিতেও বলি একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে মানিয়ে নেবেন। অর্থাৎ কিল চড় এড়িয়ে যাবেন।

তবে সমস্যা সেখানে নয়। সমস্যা হচ্ছে বেত মেরে সত্যি সত্যি ছাত্রছাত্রীদের কিছু শেখান যায় কিনা। এ নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে মনোবিজ্ঞানীরা নানান গবেষণা করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে নিশ্চিত ফলাফল পাওয়া যায়নি। কোন দিন বেত মারা হয়নি এমন ছাত্রও অসম্ভব সুশিক্ষিত হয়েছে, এমন নজিরও যেমন ভূরি ভূরি নেই, তেমনি বেত খেয়েছে এমন সব ছাত্র বখে গেছে, তেমনটাও কখনও হয়নি। তবু শিক্ষাবিদ আর মনোবিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে একমত যে বেত না মেরে শিক্ষাদানই উত্তম পদ্ধতি। এবং একথাও সত্য যে আগের চেয়ে বেতের রেওয়াজ এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনেকাংশে কমে গেছে। তবু বেত আছে।

সম্প্রতি বৃটিশ পার্লামেন্ট ছাত্রছাত্রীদের বেত মারা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। ইউরোপের অন্যান্য দেশে আগে থেকেই বেত মারার রীতি নিষিদ্ধ রয়েছে। ১৯৮২ সালে ইউরোপের মানবাধিকার আদালত রায় দিয়েছিল যে বাবামায়েরা সন্তানের ওপর দৈহিক শাস্তির ব্যাপারে আপত্তি করলে তাদের ইচ্ছার মূল্য দিতে হবে। সেক্ষেত্রে দৈহিক শাস্তি গ্রহণে অস্বীকৃত ছাত্রছাত্রীকে বহিষ্কার করা যাবে না। বহু অভিভাবক নিশ্চয়ই এ ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাবেন। কিন্তু অনেকেই এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন যে দৈহিক শাস্তি যদি তুলে দেয়া হয়, তাহলে ছাত্রছাত্রীদের সংশোধনের চরম ব্যবস্থাই তুলে দেয়া হবে। তবুও যারা মনে করেন শারীরিক শাস্তির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সংশোধন করা সম্ভব, তাদের ধারণা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেয়া হয়নি। বৃটেনের শুধু মাত্র সরকারী স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য। বেসরকারী স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের সংশোধন ও সুশৃংখল করার জন্য এখনও দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থা চালু আছে। উল্লেখ্য, বৃটেনের ৯৭ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে শতকরা মাত্র ৬ জন সরকারী স্কুলে পড়ে। সেখানে নাকি শাস্তির ব্যবস্থা শত শত বছরের ঐতিহ্য। এবং সেখানে বর্তমানে বেতমারার রেওয়াজ কমলেও প্রতি বছর সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের কম পক্ষে আড়াই লক্ষ ঘা বেত মারা হয়।

তবু প্রশ্ন থেকেই যায়, সত্যিসত্যি বেত মেরে নাকি স্নেহ মমতা দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের অধিকতর সুশৃংখল ও শিক্ষামনস্ক করে তোলা যায়? তাই এইসব দ্বিধা সত্ত্বেও আমরা মনে করি বেত মারার রেওয়াজের অবসানই স্বাস্থ্যকর শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। কারণ শারীরিক শাস্তির মধ্য দিয়ে মানসিক উৎকর্ষ কতটা সম্ভব, তা এখন অসংখ্য প্রশ্নে আবদ্ধ। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস নিরন্তর প্রয়াসের মধ্য দিয়েই ছাত্রদের মনোযোগী ও সংশোধিত করা সম্ভব। এবং শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেকথাই সত্য যে শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যে গো।

—দর্শক